Rajshahi University journal of arts & law
Vol. 54, Issue 1 (2026), pp. 197-213
DOI: https://doi.org/10.64102/rujal.0731
ISSN 2309-0898 (Print)
ISSN 2408-8773 (Online)

১৯৯০ এর দশকে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব: একটি বিশ্লেষণ
[The Ideological Conflicts within the Communist Movement of Bangladesh in the 1990s: An Analysis]

নাজনীন সুলতানা*

Abstract

This study examines the ideological and organizational crisis that struck the Communist Party of Bangladesh in the early 1990s, precipitated by the fall of the Soviet Union and the downfall of socialist governments in Eastern Europe. These global developments had a deep effect on left movements everywhere, especially in Bangladesh, where inner strife between reformist and orthodox groups deepened. The party faced a dual challenge: the need to reboot its ideological principles in response to a changing global context and the need to maintain internal unity in the face of competing strategic visions. Through an in-depth analysis of the events of 1991-1993, including party congresses, leadership conflicts, and ideological debates, this study highlights the way in which theoretical divergence led to political fragmentation. The research also investigates how dependence on Soviet ideological sponsorship influenced the party's structural volatility after 1991. In short, it is the argument of this paper that the ideological divide within the party was a reflection of international developments and an effort to reconcile socialism with the political reality of Bangladesh.

Keywords: Communist Party of Bangladesh; Collapse of Soviet Union; Ideological conflict of CPB; Reform vs Orthodoxy in Bangladesh; Leftist movement crisis in Bangladesh.

১৯৯০-এর দশকের সূচনাশেষে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক ও আদর্শগত সংকটের মুখোমুখি হয়, যা শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ মতবিরোধের ফল ছিল না, বরং বৈশ্বিক রাজনৈতিক পরিবেশে ঘটে যাওয়া মৌলিক পরিবর্তনের একটি প্রত্যক্ষ প্রতিফলন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধস আন্তর্জাতিকভাবে বামপন্থী আন্দোলনের উপর গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে, যার প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে আদর্শ ও নেতৃত্বগত প্রশ্নে দ্বিধা, বিভ্রান্তি এবং মতানৈক্য প্রকট হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষাপটে দলটি একদিকে রাজনৈতিক দিকনির্দেশনার অভাবে সংকটগ্রস্ত হয়ে পড়ে, অন্যদিকে আদর্শগত পুনর্বিন্যাসের প্রশ্নে প্রবল বিভাজনে পতিত হয়।

বর্তমান গবেষণাপত্রে এই সময়কালটিকে একটি বিশ্লেষণযোগ্য ঐতিহাসিক অধ্যায় হিসেবে পর্যালোচনা করা হয়েছে, যেখানে আদর্শ, বাস্তবতা ও নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব দলীয় সংহতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন নিছক একটি রাষ্ট্র কাঠামোর বিলুপ্তি ছিল না; এটি ছিল সমাজতান্ত্রিক মতবাদের ঐতিহাসিক গ্রহণযোগ্যতা ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপনের প্রক্রিয়া। এ ঘটনার পর বিশ্বের নানা দেশে বামপন্থী রাজনৈতিক শক্তিগুলো যেমন নিজেদের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হয়, তেমনি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিও নিজের কৌশল, আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে গভীর পুনর্মূল্যায়নের মধ্যে প্রবেশ করে। দলটির অভ্যন্তরে দুটি স্পষ্ট

* পিএইচডি ফেলো, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, বাংলাদেশ;
E-mail: sultananaznin84@gmail.com

মতধারা–সংস্কারপন্থী ও কট্টরপন্থী–উত্থিত হয়, যারা সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ রূপরেখা এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রয়োগ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে।

এই দ্বন্দ্ব একদিকে যেমন তাত্ত্বিক আলোচনা ও আদর্শগত বিতর্কের পরিসর সম্প্রসারিত করে, তেমনি অন্যদিকে সাংগঠনিক ভারসাম্য ও ঐক্যকে ভেঙে দেয়। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত সময়কে এদৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা যায়, কারণ এই সময়কালেই দলটির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সর্বাধিক তীব্র হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত পার্টি বিভাজনের দিকে এগিয়ে যায়। এই অধ্যায়টি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণ, যেখানে একটি আদর্শিক সংগঠন নিজ অস্তিত্ব, ভূমিকা ও ভবিষ্যৎ কৌশল নির্ধারণে এক জটিল সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়।

এই প্রবন্ধে ১৯৯১-১৯৯৩ সময়কালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি ও অভ্যন্তরীণ আদর্শিক দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনের কারণ, ধরন ও ফলাফল অনুসন্ধান করা হয়েছে। এতে দলীয় সিদ্ধান্ত, কংগ্রেসের কর্মসূচি, মতানৈক্যের প্রকৃতি এবং বিভক্তির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে, যা শুধুমাত্র একটি দল নয়, বরং একটি আদর্শের রূপান্তর প্রক্রিয়াকেও চিহ্নিত করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ভাঙন ও পতন: ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক আন্দোলনের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। লেনিন পরবর্তী নেতা যোসেফ স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। পরবর্তীতে নিকিতা ক্রুশ্চেভ (১৯৫৫-৬৪) এবং তার উত্তরাধিকারী লিওনিদ ব্রেজনেভ (১৯৬৪-৮২) এর সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সুদৃঢ় হয়। মূলত সামরিক শক্তির বৃদ্ধি সোভিয়েত ইউনিয়নকে শক্তির এক দেশে পরিণত করে। ১৯৮০ সালের ১৫ মার্চে মিখাইল গর্বাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে যে সংস্কার কার্যক্রম শুরু করেন তাতেই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সূত্রপাত ঘটে।[1] তাঁর "Peace has no alternative" তত্ত্ব প্রয়োগ করে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র ও অভ্যন্তরীণ নীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পরিকল্পনা করেন।[2] তিন রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে সুসংগঠিত করার জন্য 'Glasnost' নামে নতুন এক সংস্কার কার্যক্রমের সূত্রপাত ঘটান।[3] 'Glasnost' যার অর্থ উন্মুক্তকরণ।[4] গ্লাসনস্ত রুশ শব্দ যার অর্থ উন্মুক্তকরণ। মিখাইল গর্বাচেভ তার প্রশাসনকে পুনর্বিন্যাস করার জন্য গ্লাসনস্ত নীতিটি প্রয়োগ করে রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করেন। "গ্লাসনস্ত নীতিতে মার্কসবাদ- লেনিনবাদ তত্ত্ব থেকে অনেকটাই সরে আসা হয়।[5] পূর্বে যেখানে একদলীয় শাসনব্যবস্থা ছিল সেখানে বহুদলীয় ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে "গ্লাসনস্ত" সংস্কারের মাধ্যমে।[6] এই ধারায় বহু রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি পায়, নিষিদ্ধ গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হয়, এমনকি সরকার সমালোচনার ক্ষেত্রও উন্মুক্ত হয়।[7]

এছাড়া মিখাইল গর্বাচভ অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যক্রম শুরু করেন যা পেরেস্ত্রইকা (Perestroika) নামে খ্যাত। পেরেস্ত্রইকা রুশ শব্দ যার অর্থ পুনর্বিন্যাস। এ ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা থেকে সরে এসে সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিবাদী বাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়।[8] এ ব্যবস্থার দ্বারা সোভিয়েত শিল্প কল-কারখানাসমূহ বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয় এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সিংহভাগ ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হয়। এ সংস্কার ব্যবস্থার দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করা হয় এবং জোসেফ স্ট্যালিনের সময়ে নিষিদ্ধ গ্রন্থসমূহ সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দান করা হয়।[9] এছাড়া মিখাইল গর্বাচেভ আফগানিস্তান থেকে রুশ সৈন্য প্রত্যাহার করেন; পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট শাসন বিরোধী বিদ্রোহ দমন করার চেষ্টা করেন না;

দুই জার্মানির একত্রীকরণে কোন বাধা প্রদান করেন না। তিনি ভিয়েতনাম ও কাম্পুচিয়া থেকে রুশ সৈন্য প্রত্যাহার করেন। এসবের মাধ্যমে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে শান্তি বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। কিন্তু এসব পদক্ষেপ ছিল অসম্পূর্ণ ও সাংগঠনিকভাবে দুর্বল পদক্ষেপ। ফলে আশানুরূপ ফল আসেনি; বরং এতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, পণ্যসঙ্কট ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলতা আরও বাড়তে থাকে।[10] কিন্তু গ্লাসনস্ত সংস্কার আপাতদৃষ্টিতে শান্তি স্থাপন করলেও পরবর্তীতে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়---সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে।[11]

পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে গ্লাসনস্ত নীতি বাস্তবায়নের ফলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়ে এবং এ এলাকায় বড় পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটে। হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়াসহ বিভিন্ন দেশের সরকার কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে যায়। বিশেষ করে লিথুয়ানিয়ার জনগণ একজন অকমিউনিস্টকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে এবং সোভিয়েত বাল্টিক রাষ্ট্রের নাম পরিবর্তন করে লিথুয়ানিয়া প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে।[12] বুলগরেয়িার রাজধানী সোফিয়াতে প্রায় ১,৫০,০০০ মানুষের সমাবেশে কমিউনিস্ট বিরোধী শ্লোগান উঠে। রোমানিয়ার জনগণ বুখারেস্টে বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় এবং কমিউনিস্ট প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট চওচেস্কুর পতন ঘটিয়ে তাকে হত্যা করে।[13]

সোভিয়েত ইউনিয়নে গ্লাসনস্ত সংস্কারের ফলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তত্ত্বের প্রয়োগ যত কমতে থাকে পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলোতে কমিউনিস্ট বিরোধী আন্দোলন ততই জোরদার হতে থাকে। মিখাইল গর্বাচেভের গ্লাসনস্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের পাঁচ বছরের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বেশ কিছু অঞ্চল স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং এ সব অঞ্চলে একদলীয় শাসনব্যবস্থার স্থলে বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।[14]

মিখাইল গর্বাচেভের গ্লাসনস্ত সংস্কার সমাজ উন্নয়নে যা ভূমিকা রেখেছে তার চেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গনের পথ সুগম করতে। কারণ এ সংস্কারের মূল নীতি ছিল সমাজ পরিবর্তনের জন্য গণতন্ত্রায়ণ। এটি সংরক্ষণের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে আইনও প্রণয়ন করা হয়।[15]

মিখাইল গর্বাচেভের পেরেস্ত্রইকা নীতির ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতি সুদৃঢ় হওয়ার পরিবর্তে বরং ভেঙ্গে পড়ছিল। আসলে সত্তর দশক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক অবক্ষয় শুরু হয়েছিল। রুশ অর্থনীতিবিদ আগানবেগানের বক্তব্য অনুযায়ী, ষাটের দশক থেকে সোভিয়েত অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার ছিল নিম্নরূপ:

সময়কাল	প্রবৃদ্ধির শতকরা হার
১৯৬৬-১৯৭০	৪১
১৯৭১-১৯৭৫	২৮
১৯৭৬-১৯৮০	২১
১৯৮১-১৯৮৫	১.৬৫

উৎস: F. D. Holliday and J. G. F. Johnson, "Soviet Economic Growth, 1928-1985" (RAND Corporation, 1989), accessed December 16, 2025, https://www.rand.org/pubs/joint_ reports-soviet/JRS04.html.

বিশেষজ্ঞদের মতে, ১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে সোভিয়েত অর্থনীতির বার্ষিক প্রবৃদ্ধি প্রায় ৩.৭% ছিল, যা ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সালে কমে ২.৬%-এ দাঁড়ায়। ১৯৮০-এর দশকের প্রথম দিকে এটি আরও কমে ২%-এ নেমে আসে। বিশ্লেষক জর্জ আগানবেগান এই অর্থনৈতিক পতন সম্পর্কে মত দেন

যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অধীনে উৎপাদনশীলতার উন্নতি এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের অভাব ছিল অন্যতম বড় সমস্যা। এ ছাড়া দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রচেষ্টা দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছিল।[16]

ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ ও ইন্সটিটিউটের সহযোগী পরিচালক দোমিনিক মইসি মন্তব্য করেন-

> এক যুগেরও কম সময়ে এই দেশটি সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে আমার এখন আর কোন ভীতি নেই। যে পরাশক্তির নাগরিকদের টয়লেট পেপার সংগ্রহ করতে হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়, সেই পরাশক্তিকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ আছে কি? তবে ভয় পাচ্ছি এই ভেবে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের হবেটা কি?[17]

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে কেবলমাত্র দোমিনিক মইসি এর মতো বিদেশীরাই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন তা নয় বরং সোভিয়েত ইউনিয়নের বুদ্ধিজীবীদের মাঝেও এর প্রতিফলন দেখা দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশ একের পর এক স্বাধীনতা ঘোষণা করায় অর্থনীতি শূন্যের কোঠায় পৌঁছে। আর এর ফলেই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন অনেকটাই অবশ্যম্ভাভি হয়ে পড়ে।[18]

মিখাইল গর্বাচেভের পেরেস্ত্রোইকা ও গ্লাসনস্ত সংস্কারের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন কমিউনিস্ট শাসন ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ছিল। এ সময় মিখাইল গর্বাচেভের উদার নীতিগুলোও সোভিয়েত ক্ষমতার ভিত্তিকে দুর্বল করেছিল। ১৯৯১ সালের আগস্ট মাসে সোভিয়েত পার্টির মধ্যেই গর্বাচেভের বিরুদ্ধে একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থান চেষ্টা হয়। এই ব্যর্থ অভ্যুত্থান সোভিয়েত সরকারের দুর্বলতা প্রকাশ করে। এর ফলশ্রুতিতে, বরিস ইয়েলৎসিন রাশিয়ার নেতৃত্বে আসেন এবং গর্বাচেভের ক্ষমতা কমে যায়। ইয়েলৎসিন সংস্কারের ক্ষেত্রে গর্বাচেভের চাইতেও বেশী অগ্রসর ছিলেন। তিনি বাল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করেন এবং ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে আলমা-আটা চুক্তির মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের ১১টি প্রজাতন্ত্র সমন্বয়ে কমনওয়েলথ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস (CIS) গঠন করেন। এই পর্যায়ে ১৯৯১ সালের ২৫ ডিসেম্বর গর্বাচেভ আনুষ্ঠানিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায়।[19]

গর্বাচেভের সংস্কার কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক কাঠামোকে সময়োপযোগী করে তুলতে চাওয়া, কিন্তু বাস্তবে তা ছিল অপরিকল্পিত, অভ্যন্তরীণ সমন্বয়হীন এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই বিপর্যয়কর ফল তা বিপর্যয়কর ফল বয়ে আনে। পরবর্তী বিশ্লেষণে দেয়া যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের মূল কারণ ছিল কেবল গ্লাসনস্ত বা পেরেস্ত্রইকা নয়, বরং দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক জড়তা, প্রযুক্তিগত স্থবিরতা, উৎপাদনশীলতার অভাব, এবং নাগরিক সমাজের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, যা একসাথে মিলে একটি পরাশক্তিকে ভিতর থেকে ক্ষয় করে দেয়।[20]

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সোভিয়েত নির্ভরশীলতা

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের গভীর প্রভাব বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে পড়ে এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলনে পরিবর্তনের ধারার সূত্রপাত ঘটায়। ১৯৯১-১৯৯৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দকে সংকটজনক অবস্থা অতিবাহিত করতে হয়। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশাপাশি পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতেও কমিউনিস্ট শাসন ভেঙ্গে পড়ে। এই কমিউনিস্ট পতনের প্রভাব বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে আঘাত করে। তবে শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটই নয় নব্বই দশকের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে জড়িত নেতৃবৃন্দের আভ্যন্তরীণ মতানৈক্যও কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভক্তির জন্য দায়ী।

বাংলাদেশের কমিউনিস্টরা শুরু থেকেই তাত্ত্বিক বিষয়ের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নির্ভরশীল ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতাকর্মী সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে শিক্ষা ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ পেতেন। সোভিয়েত সরকার বাংলাদেশের কমিউনিস্টদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও তাত্ত্বিক বিষয়ে সর্বদা সহায়তা করে থাকতেন।[21]

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে মস্কো স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আন্দোলনের বিষয় স্বায়ত্ত্বশাসন তাই তারা এ আন্দোলনকে সমর্থন দিবেন না। সোভিয়েত সমর্থন আদায়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদকে মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট নেতা মণি সিংহের শরণাপন্ন হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। অবশেষে মণি সিংহের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল মস্কো গমন করে সোভিয়েত নেতাদের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন দিতে সম্মত করান।[22] ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন সার্বিক সহায়তা প্রদান করে। এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক জোরদার হয়। মুক্তিযুদ্ধে সহায়তার মধ্য দিয়ে দেশ প্রেমিক কমিউনিস্টরা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি আরো ঝুঁকে পড়ে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে জড়িত নেতাকর্মীদের চিন্তা ও মনে এ বিশ্বাস জন্ম নেয় যে, সোভিয়েত সহযোগিতা ছাড়া বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের কমিউনিস্টগণ এ কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করতেন যে, তাত্ত্বিক বিষয়ে বাস্তব প্রশিক্ষণ ও আন্দোলনের দিক নির্দেশনা তারা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পেতেন।[23] ১৯৭২ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক উন্নত চিকিৎসা ও শিক্ষা গ্রহণের জন্য গমন করেন তাদের অধিকাংশই কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। অসুস্থ কমিউনিস্ট নেতাকর্মীদের সোভিয়েত ইউনিয়নে বিনা পয়সায় চিকিৎসা সেবা দেয়া হত। বাংলাদেশের যেসকল ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে গমন করত তাদের সবার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা থাকত। কমিউনিস্ট পার্টির ব্যানারে যারা যেত তাদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া হতো।[24] ফলে স্বাভাবিকভাবে ক্রমশ: বাংলাদেশের কমিউনিস্টগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত নির্ভরশীলতা এক স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিল। ফলে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন ভেঙ্গে যায় তখন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন এক প্রকার স্তব্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। কমিউনিস্ট পার্টিতে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা।[25] পূর্বে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব দেখা দিলে শেষ পর্যন্ত তার চূড়ান্ত মীমাংসা হতো সোভিয়েত ইউনিয়নের পরামর্শ অনুসারে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি তার রাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণে সোভিয়েত পরামর্শ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করতো। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি তার সব চাইতে বড় মিত্র হারিয়ে ফেলে। ফলে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হলে তার মীমাংসা করার জন্য কেউ থাকে না। দল নি:সঙ্গ এক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। আর ১৯৯০ এর দশকের শুরুতে বিভিন্ন দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক ইস্যুতে কমিউনিস্ট পার্টিতে অভ্যন্তরীণ মতানৈক্য তীব্র হয়ে উঠে কিন্তু এ পর্যায়ে সে সকল সমস্যা মীমাংসা করার কেউ থাকে না।

১৯৯০ দশকে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস ও দলের ভাঙ্গন রোধ প্রচেষ্টা

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের প্রাক্কালে সারা বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনে পরিবর্তন আসে। সোভিয়েত মডেলের পতন শুধু রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধস নয়, এটি ছিল আদর্শগত একটি বিশাল ধাক্কা, বিশেষ করে যেসব কমিউনিস্ট দল সোভিয়েত মডেলকে অনুসরণ করতো তাদের জন্য। বাংলাদেশের

কমিউনিস্ট পার্টিও এই ঘটনার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। সোভিয়েত মডেলের পতনের পর কমিউনিজমের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা বিতর্ক শুরু হয়। এ সময় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরেও মতাদর্শগত বিরোধের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থার পটভূমিতে ১৯৯১ সালের ৩ থেকে ৮ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস। এই কংগ্রেস দেশের বামপন্থী রাজনীতির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়য়ের পতনের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলন রিপোর্টের শুরুতেই বলা হয়,

> আমাদের এত চেনা-জানা বিশ্ব কোন কোন দিক থেকে এক নতুন বিশ্ব হয়ে উঠেছে। ঘটনাবলীর আকস্মিকতা ও অভিনবত্ব আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে গভীরভাবে আলোড়িত করছে। অনেক ক্ষেত্রে এই সকল পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এখন পর্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করেনি।[26]

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংকটের মুখে বাংলাদেশের কমিউনিস্টদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় দলের আদর্শিক ও সাংগঠনিক কাঠামোকে পুনবিন্যাস করে দলের ভাঙ্গন রোধ করা। তবে দলের কট্টোরপন্থী অংশ যে কোন ধরনের সংস্কারকে ষড়যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করছিল। তাদের মতে, এটি কমিউনিস্ট পার্টিকে সম্পূর্ণ বিলুপ্তির দিকে নিয়ে যাবে।[27] ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য দেখা দেয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের প্রেক্ষাপটে দলের অনেক সদস্য সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবতে শুরু করেন। এর ফলে দলের একাংশ দল পুনর্গঠন ও সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করে। তারা দলের গঠনতন্ত্র ও আদর্শিক অবস্থানে পরিবর্তন আনার প্রস্তাব দেয়, যাতে নতুন বাস্তবতা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সাথে খাপ খাইয়ে এগিয়ে চলা যায়।

এই অবস্থায় দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের একাংশ পরিবর্তনের পক্ষে অবস্থান নেয়, তারা দলের গঠনতন্ত্র সংশোধনসহ নতুন রাজনৈতিক দলিল গ্রহণ করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে করে সংশোধনপন্থী সদস্যদের দলের মধ্যে প্রভাব বাড়তে থাকে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরাও উল্লেখযোগ্যভাবে সংশোধন বাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। যদিও এই পদক্ষেপগুলো পার্টির পুনর্গঠন এবং নতুনভাবে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, কিছু সদস্য এগুলোকে আদর্শিক বিভাজন হিসেবে দেখেন এবং উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

আবার কেন্দ্রীয় কমিটির একাংশ ভিন্নমত পোষণ করে। তারা মনে করছিলেন যে, এসব পরিবর্তন পার্টির মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। যদিও তাদের সংখ্যা কম ছিল, তাদের উদ্বেগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রকাশ্য ছিল এবং পার্টির অভ্যন্তরীণ আলোচনায় গুরুত্ব পায়। পরবর্তীতে, কেন্দ্রীয় কমিটির বাইরের অনেক কর্মীও এই বিষয়ে অংশ নেন এবং পার্টির ঐক্য ও আদর্শিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। এই প্রচেষ্টা পার্টির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়ক হয় এবং বিভিন্ন মতামতের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি সমাধানের পথ খোঁজা হয়।

১৯৯১ সালের পর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙন রোধ ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ শুরু করে, তবে এ প্রয়াসে তারা অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের সহায়তা লাভ করে নাই। যদিও কমিউনিস্ট পার্টি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পার্টির ভাঙ্গন রোধের ক্ষেত্রে কোন সহায়তা করার আগ্রহ দেখা যায়নি। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙন রোধ ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বামফ্রন্টের সাথে সমঝোতার একটি রূপরেখা তৈরি করে।

পার্টির সদস্যদের মধ্যে একটি বিশ্বাস ছিল যে, এরশাদ সরকারের পতনে গণআন্দোলনে তারা যে ভূমিকা রেখেছিল, ঠিক একইভাবে তারা নিজেদের ঐক্য রক্ষা করতে এবং ভবিষ্যৎ নিরাপদ করতে সফল হবেন। তবে বাস্তবে, তাদের প্রচেষ্টা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল বয়ে আনতে ব্যর্থ হয় এবং পার্টির মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে, পার্টির নেতা-কর্মীদের মধ্যে হতাশার ছাপ পড়ে। তারা নিজেদের মধ্যে একটি অশান্তির আবহ তৈরি হতে দেখে এবং নিজেদের আদর্শ ও রাজনৈতিক অবস্থানকে সমর্থন দেওয়ার জন্য একত্রিত হতে পারছিলেন না। ফলে, পার্টির ঐক্য রক্ষা এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাপারে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়, যা ভবিষ্যতে দলের কার্যক্রমে হতাশা সৃষ্টি করে।[28]

এ অবস্থায়, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি নিজেদের মধ্যে ঐক্য অটুট রাখার জন্য কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পদক্ষেপসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

ক) শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐক্য সম্পর্কে দলের কৌশল নির্দিষ্ট করা;
খ) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিসমূহের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা;
গ) গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল জোটের মিত্র হিসেবে কাজ করা; এবং
ঘ) গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে শক্তিশালী রাজনৈতিক প্লাটফর্ম হিসেবে বাম ঐক্য গড়ে তোলা।[29]

১৯৯১ সালের কংগ্রেসে দলের সংস্কারপন্থীরা মনে করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংস্কার থেকে শিক্ষা নিতে হবে। যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মাধ্যমে মেহনতী মানুষের মুক্তি আনা সম্ভব নয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজের ধারণা বাস্তব সম্মত নয়, এ ব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষাপটে ব্যর্থ ব্যবস্থা। সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টির মূল লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য থেকে সরে আসা। কট্টোরপন্থী কমিউনিস্টগণ সংস্কারে সম্মত ছিল না। ফলে উভয়পক্ষ আপোষমূলক ব্যবস্থা হিসেবে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। পঞ্চম কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে,"যদিও কমিউনিস্টদের লক্ষ্য সমাজতন্ত্র ও সমাব্যবাদী সমাজ নির্মাণ করা কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে তার বিষয়গত শর্তগুলি অনুপস্থিত। তাই এই শর্তগুলি পূরণের লক্ষ্যেই আমাদের সমাজে প্রথমে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রূপান্তরের নুতন এক পর্যায় অতিক্রম করতে হবে।[30] আর এই পর্যায় অতিক্রমের সময় আশু কর্তব্য হিসেবে সার্বিক পশ্চাদপদতা দূর করার জন্য উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার কাজকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।[31] এখানে আরো সিদ্ধান্ত হয় যে, দুনিয়াব্যাপী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আন্দোলনের যেসব অভিজ্ঞতা এ যাবৎ অর্জিত হয়েছে তা বিবেচনায় নিয়ে মার্কসীয় মতার্দশগত ধারায় আরো বেশী সৃজনশীলভাবে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। আমাদের পার্টিকে হতে হবে মেহনতী জনগণের বিপ্লবী রাজনৈতিক দল।[32]

কিন্তু নেতাকর্মীদের মতপার্থক্য এতটাই প্রকট আকার ধারণ করে যে পার্টির মধ্যে সংস্কারপন্থী ও কট্টরপন্থী নামে দুটো ধারার উদ্ভব হয়। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে মতবিরোধ ও আদর্শিক বিরোধ তীব্র হয়ে পড়ে এবং দল সংস্কারপন্থী ও কট্টোরপন্থী এই দুইভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। দুই পক্ষের মধ্যে মতবিরোধের বিষয়গুলি ছিল নিম্নরূপ।

মতবিরোধের বিষয়সমূহ

১. সাম্যবাদ বনাম গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র: দলের ভেতরে দুইটি প্রধান মতামত ছিল। সংস্কারপন্থীগণ চেয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের প্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শিক নীতি পরিবর্তন করে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে। অপরদিকে কট্টোরপন্থীগণদের অভিমত ছিল, কমিউনিস্ট পার্টিকে তার ঐতিহ্যবাহী সাম্যবাদী নীতিতে দৃঢ় থাকতে হবে এবং মূল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চেতনার সঙ্গে আপস করা যাবে না।

২. দলীয় নির্বাচন ও রাজনৈতিক কৌশল: সংস্কারপন্থীগণ মনে করতেন, যে প্রথাগত নির্বাচনী রাজনীতিতে তাদের আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করা উচিত এবং বৃহত্তর বামপন্থী জোট গঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রভাব বাড়াতে হবে। অপরদিকে কট্টোরপন্থীগণ এই কৌশলকে সঠিক বলে মানতে চাননি তাঁরা আন্দোলনের মাধ্যমে বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে ছিলেন।

৩. সোভিয়েত পতনের প্রভাব: ১৯৮৯-৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক শাসনের অবসান কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে আদর্শিক আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করে। এর ফলে সংস্কারপন্থীগণ নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, অপরদিকে কট্টোরপন্থীগণ মনে করতেন, সোভিয়েত পতন সাম্যবাদী আদর্শের ব্যর্থতা নয়।

মতাদর্শগত বিরোধের ফলে কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক শক্তি দুর্বল হতে থাকে এবং জাতীয় রাজনীতিতে এ দলের প্রভাব সীমিত হয়ে পড়ে। এই বিভেদ সিপিবির সাংগঠনিক শক্তিকে দুর্বল করে দেয় এবং দলটি জাতীয় রাজনীতিতে অবস্থান হারায়।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে তাত্ত্বিক বিরোধ ও ভাঙ্গন

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কট্টরপন্থীদের অভিমত ছিল, "সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটলেও সমাজতন্ত্রের পতন ঘটে নি।"[33] তাদের মতে, "আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিভূত মডেলের সমাজতন্ত্র সাম্যবাদের মূল মর্মবস্তু মুক্ত মানুষের মুক্ত সমাজ থেকে বিচ্যুত এক ধরনের বিকৃতি।"[34] যা ঘটেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে ফলে এখানে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে সরে আসার কারণেই পতন ঘটেছে কাজেই দলের ভাঙ্গনরোধ করে দলকে সংঘবদ্ধ রাখতে গেলে দৃঢ়ভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে অনুসরণ করতে হবে এবং জাতীয় রাজনৈতিক সংকটসমূহও উক্ত মতবাদের আলোকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।[35] তাদের মতে, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে জড়িত নেতাকর্মীরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব সঠিকভাবে বুঝতে না পেরে বিভিন্ন ধরনের অপব্যাখ্যার অবতারণা করেন। আর তাদেরই তাত্ত্বিক অজ্ঞতা থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনে শুরু হয় একাধিক বিশৃঙ্খলা। তারা আরো বলেন যে, গোঁড়া, সংকীর্ণতাবাদী, স্ট্যালিনবাদী, আমলাতান্ত্রিক বা কট্টরবাদী হওয়ার কোন উদ্দেশ্য তাদের নেই। তারা বাংলাদেশেও প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য কাজ করে যাবে। কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ জাতীয় সম্মেলনে তারা ঘোষণা করেন যে,

> আমরা কমিউনিস্ট পার্টিকে শক্তিশালী ও সংহত করতে চাই। আমরা পার্টিতে ভাঙ্গনের বিরুদ্ধে। আমরা পার্টির ঐক্য চাই এবং সেজন্য পাটির অস্তিত্ব রক্ষা করতে চাই। আমরা পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসে পার্টির নাম, পার্টির শ্রেণীগত ভিত্তি, পার্টির মতাদর্শগত ভিত্তি সম্পর্কে সংশোধিত গঠনতন্ত্রে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে আগামী ষষ্ঠ কংগ্রেস পর্যন্ত সেভাবেই তা বহাল রেখে চলার পক্ষে।[36]

এ ঘোষণার পক্ষে যারা ছলিনে তাঁরা হলনে, অজয় রায়, সারোয়ার আলী, রতন সেন, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, মুনীরুজ্জামান ও এম.এম. আকাশ।[37] তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের কারণ বিশ্লেষণ করে তার একটি ব্যাখ্যাও দেন।

কমিউনিস্ট পার্টির এ পক্ষ, তাদের ভাষায়, মার্কসীয়-লেনিনীয় সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিপর্যয়ের জন্য নিম্নেবর্ণিত কারণসমূহকে দায়ী করেন:-

১. পুঁজিবাদী বিশ্বের অব্যাহত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাপ;
২. সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন কাঠামোর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ধীরগতি;

৩. উন্নত উৎপাদন কাঠামোর অভাব;
৪. জনগণের মৌলিক সমস্যার সমাধানে জরুরীভিত্তিতে পদক্ষেপ না নেয়া;
৫. পার্টির অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নামে অতিরিক্ত কেন্দ্রিকতা এবং পার্টির নেতৃত্বে অসততা এবং আমলাতান্ত্রিক হুকুমদারির বিস্তৃতি;
৬. গণতান্ত্রিক চেতনাকে বিকশিত হতে না দেয়া; এবং
৭. সর্বোপরি, মার্কসবাদ- লেনিনবাদ সমাজ তত্ত্বের বিশ্লেষণিক ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।[38]

এভাবে নব্বই দশকের প্রথম দিকে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি শীর্ষ নেতৃবৃন্দ দলের ভাঙ্গন রোধ করার চেষ্টা করেন। তাঁরা দলের নেতা-কর্মীদের সংগঠিত করতে থাকেন।

১৯৯১-১৯৯৩ এই তিন বছর বাংলাদেশের কমিউনিস্টগণ দলকে খন্ডিত হবার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দলীয় নেতা কর্মীদেরকে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চালান। একে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট পার্টিতে পক্ষ ও বিপক্ষের সৃষ্টি হয়। মার্কসবাদের প্রখ্যাত নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন বিশ্বাস করতেন যে, নিজ অবস্থান থেকে সরে আসলে কমিউনিস্ট পার্টি আর কমিউনিস্ট থাকবে না। ১৯৯১ সালের পঞ্চম কংগ্রেসে কমিউনিস্ট পার্টির যে অংশ লেনিনের এই নীতিগত অবস্থানে থেকে যায় তাদেরকেই মূলত কট্টরপন্থী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আর কমিউনিস্ট পার্টির যে অংশ সোভিয়েত কমিউনিজমের আংশিক পরিবর্তনের মাধ্যমে রূপান্তর প্রক্রিয়ার পথ বেছে নেয় সে অংশকে বলা হয় সংস্কারপন্থী। কট্টরপন্থীদের উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিস্ট আন্দোলন সফল করতে দলে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কট্টরপন্থীদের কঠোর অবস্থানের কারণে দলের ভাঙ্গন রোধ করা সম্ভব হয় না। সংস্কারপন্থীদের মতে যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে গেছে তাই কমিউনিস্ট পার্টির আর প্রয়োজন নেই। এর জবাবে কট্টরপন্থীরা বলে যে, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সফলতা, অবদান, ভুল-ভ্রান্তি, সুখ-দু:খ, গৌরব-ব্যর্থতা ইত্যাদি নিয়ে যখন সামগ্রিক বিচার বিশ্লেষণ এবং কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তখন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি বা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সংগে কোন যোগসূত্র থাকে না। সর্বোপরি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অগ্রসর হতে হবে।[39] এভাবে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের একাংশের দলের ভাঙ্গনের বিষয়ে দৃঢ় অবস্থান থাকায় এ দল ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ভাঙ্গন এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙ্গনের পটভূমি

কমিউনিস্ট পার্টির সংস্কারপন্থী অংশ দল সংস্কারের জন্য জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর অংশ হিসেবে তারা ১৯৯২ সালের ৩০ ও ৩১ অক্টোবর তারিখে কেন্দ্রিয় কমিটির সভায় পার্টির নির্বাচিত পাঁচ জন সংসদ সদস্যের তরফ থেকে বিশেষ জরুরী কংগ্রেস ডেকে পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে পার্টিকে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব উত্থাপন করে। কেন্দ্রিয় কমিটির অনেক সদস্যই এই প্রস্তাবের পক্ষে অবস্থান নেয়। এ পরিস্থিতিতে উভয়পক্ষ তাদের প্রস্তাব লিখিতভাবে উত্থাপন করে। এ সকল প্রস্তাব সাধারণ সদস্যদের মধ্যে আলোচনা ও মতামত গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে যেসব সভা অনুষ্ঠিত হয় সেসব সভায় স্বল্প সংখ্যক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিল এবং উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগই বিলোপবাদী বা সংস্কারপন্থীদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।[40]

এরপর রূপান্তর বা সংস্কারপন্থীরা জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে, সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে, মার্কসবাদ লেনিনবাদ ভুল প্রমাণিত হয়েছে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বর্তমান সময়ে অচল এক মতবাদ। বিপ্লব ও শ্রেণিসংগ্রামের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কট্টরপন্থীদের অনেককে নাস্তিক বা ধর্ম বিরোধী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এমতাবস্থায়, বিভ্রান্তি রোধ করার জন্য কট্টরপন্থীগণ ধর্ম সম্পর্কে পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি

শিরোনামে প্রস্তাব তৈরি করে প্রচার চালায়। ধর্ম সম্পর্কে পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি শিরোনামের প্রস্তাবনার কিছু অংশ উপস্থাপন করা হল,

> আমাদের দেশবাসী ধর্মপ্রাণ। দেশবাসীর বিপুল অংশ ইসলামী ধর্মাবলম্বী। এছাড়াও হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীরাও আছেন। ইসলাম ধর্মে শান্তি, মানবতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতির কথা আছে। কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রাম ধম্মের বিরুদ্ধে নয়। কমিউনিস্টরা জনগণের কল্যাণ, শান্তি, মানবতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে সেগুলো ধম্মের মধ্যেও আছে। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলো প্রগতির ধারাকে প্রতিহত করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে। পার্টিকে ধম্মের এরূপ অপব্যবহারের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করতে হবে। আমাদের দেশবাসী ধর্মপ্রাণ। দেশবাসীর বিপুলতম অংশ হল ইসলামী ধর্মাবলম্বী। এছাড়াও হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীরাও আছেন। ইসলাম ধর্মে শান্তি, মানবতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতির কথা আছে। কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রাম ধম্মের বিরুদ্ধে নয়। কমিউনিস্টরা জনগণের কল্যাণ, শান্তি, মানবতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে সেগুলো ধম্মের মধ্যেও আছে। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলো প্রগতির ধারাকে প্রতিহত করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে। পার্টিকে ধম্মের এরূপ অপব্যবহারের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করতে হবে।[41]

কট্টরপন্থীরা অভিযোগ করে, রূপান্তরপন্থীরা ধর্ম নিয়ে যে অপপ্রচার করছে তা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তারা কমিউনিস্ট পার্টিকে ক্রমে নিষ্ক্রিয় করে পার্টি বিলোপের কৌশল গ্রহণ করেছে।[42]

দলের তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠন ক্ষেতমজুর সমিতিকে ঘিরেও উভয় পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। রূপান্তরপন্থীরা মনে করছিল যে, ক্ষেতমজুর সমিতিকে একটি এনজিওতে রূপান্তরিত করা উচিত, যাতে এটি আরও কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে। কিন্তু কট্টরপন্থীরা এর ঘোর বিরোধিতা করে। তাদের মতে, ক্ষেতমজুর সমিতি এনজিও হয়ে গেলে এর দীর্ঘদিনের সফল ও প্রশংসিত কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সংগঠনটি নিজের লক্ষ্যে পৌঁছাতেও ব্যর্থ হবে। এমনকি এনজিওর কাজও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারবে না।

আর সংস্কারপন্থীদের দাবি ছিল, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অতিমাত্রাই কঠোরতার কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ছিল আমলানির্ভর। তাই বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির আমলানির্ভর মডেলের সমাজতন্ত্র যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে এজন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সংস্কার করতে হবে। কট্টরপন্থীরা সংস্কারপন্থীদের এ বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে। তাদের মতে, তারা যেন কেন্দ্রিয় কমিটিতে এ ধরণের বক্তব্য দেয়া থেকে বিরত থাকে।[43]

বিভিন্ন বিষয়ে মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের কারণে রূপান্তরপন্থীরা দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করে না এবং বির্তকিত বিষয়ে কোন সমঝোতায় আসে না। কিন্তু দলে থেকে দলকে সহযোগিতা না করায় এবং দলীয় কর্মকান্ডে নিষ্ক্রিয় থাকায় উভয় পক্ষের মধ্যে কোন প্রকার সমঝোতা হয় না। যখন একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের মধ্যেই মূল্যবোধ এবং লক্ষ্য নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় ও দলের মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। তখন এই অভ্যন্তরীণ বিভক্তি দলের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং তা দলকে ভাঙ্গনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

কট্টরপন্থীরা সংস্কারপন্থীদেরকে সমাজতন্ত্র বিলুপ্তকারী বলে অভিহিত করে। তারা আরো বলে, যে কোন মূল্যের বিনিময়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্বকে পূর্ণরূপে প্রয়োগ করে সমাজতন্ত্রকে বিকশিত করবে এবং তারা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও সুবিধাবাদ থেকে পার্টিকে মুক্ত রাখবে। ফলে দিন দিন সংস্কারপন্থী ও কট্টরপন্থীদের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙ্গন কোনভাবেই রোধ করা সম্ভব হয় না। ১৯৯৩ সালে এসে বহু প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা দল ত্যাগ করে আওয়ামী লীগ, গণফোরাম ও অন্যান্য বাম ও মধ্যবাম দলে যোগদান করেন।[44]

ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পর প্রায় সাড়ে চার দশক ধরে বাংলাদেশের ইতিহাসে কমিউনিস্ট পার্টি কখনো সরকার বিরোধী আবার কখনো সরকারি দলের সহযোগী হিসেবে জাতীয় রাজনীতিতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছেন এমন কিছু প্রবীণ দলকে ঐক্যবদ্ধ থেকে রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার পরামর্শ দেন।[45]

১৯৯৩ সালে রূপান্তরপন্থীরা কিছু নতুন নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাস্তবানুগ, সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী রূপায়নের মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনায় আনে, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রূপান্তরের মৌলিক ধারণার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের বিষয়গত ও বিষয়ীগত বাস্তবতার আলোকে কর্মসূচীর উপাদানগুলি নির্দিষ্ট করতে হবে। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রূপান্তরের সমগ্র কাজটি রাতারাতি সম্পাদিত না করে অন্তরবর্তীকালীন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পর্যায়ক্রমে তা বিকশিত করতে হবে। কর্মসূচী প্রণয়নের সময় সমাজের বহু সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেণী গঠন ও শ্রেণী বিভাজন প্রক্রিয়ার নানা গতিময় ও অগ্রসরমান বৈশিষ্ট্যগুলোর বিষয়টি পুরোপুরি বিবেচনায় রাখতে হবে। প্রয়োজনে কর্মসূচীতে থাকতে হবে বহুমাত্রিক চরিত্র।

অপরদিকে কট্টরপন্থীরা পার্টির নেতাকর্মী ও জনগণকে সুসংগঠিত করার জন্য নিম্নোক্ত ১৭ দফার কর্মসূচি পেশ করেন,[46]

১. রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিসহ ৭২ সংবিধানের মূল ভিত্তি পুন:প্রতিষ্ঠা করা।
২. দেশের অর্থনৈতিক লক্ষ্য, নীতিনির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন পরনির্ভরতা দূর করে নিজেরাই নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা করা।
৩. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিরন্ন, দারিদ্র পীড়িত জনগণের নূন্যতম বেঁচে থাকবার ব্যবস্থা নিশ্চিতসহ বহুমুখী কার্যক্রম নিশ্চিত করা।
৪. বাস্তুহীন ও নিম্নবিত্ত দরিদ্র সকল পরিবারের জন্য ৩ বছরের মধ্যে নূন্যতম বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।
৫. দেশের সকল নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য অবকাঠামো গড়ে তোলা।
৬. শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করে সার্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক বৈষম্যহীন গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা।
৭. দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে সীমিত রাখা।
৮. ঘুষ দুর্নীতি রোধ কল্পে কঠোর নির্ধারণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৯. নারী সমাজের উপর সকল বৈষম্য দূর করে সর্বক্ষেত্রে তাদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
১০. ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সকল অত্যাচার ও বৈষম্য দূর করে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
১১. বহুমুখী প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে শিশু শ্রম বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
১২. দেশের জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনা।
১৩. একটি সুষ্ঠু সামগ্রিক পানিনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং তার আওতায় সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা।
১৪. দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারে পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
১৫. দেশের সকল অঞ্চলে সুষম বিকাশের লক্ষ্যে অনুন্নত এলাকার উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেয়া।
১৬. পরিবেশ ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পরিকল্পিত বনায়নসহ বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং
১৭. বিদেশ নির্ভরতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা।[47]

কট্টরপন্থী ও বিলোপবাদীরা উভয়েই নিজের অবস্থান থেকে স্ব স্ব মতাদর্শ প্রচার করে এবং দেশ ও জনগণের সার্বিক কল্যাণকে কেন্দ্র করে কর্মসূচী প্রদান করে। তাদের সব কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয় নি। তারপরও দলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়।

১৯৯৩ সালের ২ ও ৩ মে পার্টির ভাঙ্গন রোধ করার জন্য সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিকের সভাপতিত্বে দুই দিনব্যাপী এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার এক পর্যায়ে শামসুদ্দোহা এমপি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙ্গন রোধে নিম্নের তিনটি বিষয় উপস্থাপন করেন,

১. দলের নাম পরিবর্তন;
২. পঞ্চম কংগ্রেসে গৃহীত গঠনতন্ত্র ও রাজনৈতিক প্রস্তাব অনুমোদন; এবং
৩. নেতৃত্বের পরিবর্তন।[48]

এ অবস্থায় নেতৃত্বের পরিবর্তন ও পার্টির নাম কখন পরিবর্তন করা হবে বা আদৌ পার্টির নাম পরিবর্তন করা হবে কি না এ নিয়ে শুরু হয় তুমুল তর্ক-বির্তক। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পার্টির কন্ট্রোল কমিশন দেশ, জনগণ ও পার্টির কেন্দ্রিয় নেতৃবৃন্দকে সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভুলে সমঝোতায় আসতে অনুরোধ জানান। এমনকি কমিশনের চেয়ারম্যান রঙ্গলাল সেন পার্টির ঐক্য রক্ষার জন্য কেন্দ্রিয় কমিটির নিকট প্রতিবেদন পেশ করেন।[49] ১৯৯৩ সালের মাঝামাঝি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ভবিষ্যৎ নিয়ে বুদ্ধিজীবী মহলেও নানা জল্পনা কল্পনা চলতে থাকে। এমনকি সিপিবি-র অভ্যন্তরেও এ নিয়ে অনেক কর্মচাঞ্চল্য ও কৌশলগত তৎপরতার খবর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে মস্কো থেকে সকল প্রকার সাহায্যের পথ বন্ধ হয়ে যায়। তাই বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির বিবাদমান কর্মীদের মধ্যে ঐক্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।[50] পার্টির ঐক্য রক্ষায় সংস্কারপন্থীরা ইতিবাচক সাড়া দিলেও কট্টরপন্থীরা এই অজুহাতে দূরে সরে দাঁড়ায় যে, সংস্কারপন্থীরা কমিউনিস্ট আদর্শ থেকে বেরিয়ে এসেছে। এছাড়াও কট্টরপন্থীদের দাবি ছিল সংস্কারপন্থীদের কোনভাবেই কমিউনিস্ট বলা যায় না। ফলে আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও সিপিবি-র কন্ট্রোল কমিশন কর্মীদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়।[51] শেষ পর্যন্ত ১৯৯৩ সালের জুনের মাঝামাঝি পার্টির বিশেষ জাতীয় সম্মেলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির বিভক্তির আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (কট্টরপন্থী) ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সংস্কারপন্থী) নামে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী চার বছর পর পর পার্টির জাতীয় সম্মেলন করার বিধান রয়েছে। কিন্তু অক্টোবর পর্যন্ত অপেক্ষা না করে ছয় মাস আগেই ষষ্ঠ জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে এমন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করতে হয় যে ১৯৯৩ সালের জুন মাসে বিশেষ জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত করতে বাধ্য হয়।[52] এরপর ১৫ ও ১৬ জুন একই দিনে পৃথক পৃথক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[53] বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সংস্কারপন্থীদের) সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নূরুল ইসলাম নাহিদ। অপরদিকে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (কট্টরপন্থী) নেতা নির্বাচিত হন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। তিনি সম্মেলনে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব ও আদর্শ কোনভাবেই বিলুপ্ত করা যাবে না। মূলত পার্টির দুই গ্রুপের নেতাকর্মীদের অনমনীয় মনোভাবের ফলে পার্টির বিভক্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়।[54] অবশেষে ১৯৯৩ সালে বিশেষ কংগ্রেসের পর থেকে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিখন্ডিত হয়ে পড়ে।

এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের কমিউনিস্টগণ যাতে বিভ্রান্ত না হয় তার জন্য বিলোপবাদ ও মূল অংশের সমর্থকদের মধ্যে দুই দলিল সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়। ১৯৯৩ সালের জুন মাসের বিশেষ জাতীয় সম্মেলনকে কেন্দ্র করে পার্টির মূল অংশ পার্টির ঐক্য ও বিভক্তির বিষয়টিতে সচেতন হয় এবং সকলকে সঠিক ধারণা দিতে থাকে। অপরদিকে বিলোপবাদীরা তাদের পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনে এবং বিশেষ জাতীয় সম্মেলনে (১৯৯৩ সালের জুন মাস) যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

১৯৯৩ সালের জুন মাসে বিশেষ জাতীয় সম্মেলন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে এ ধরনের প্রথম সম্মেলন। সম্মেলনটির প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল পার্টির অস্তিত্ব রক্ষার। পার্টি থাকবে কি থাকবে না এটাই ছিল চ্যালেঞ্জের বিষয়। বিশেষ জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে পার্টি তার অভ্যন্তরের ও বাইরের ভিন্নমতাবলম্বীদের চিহ্নিত করে দলের ভাঙ্গন রোধের বিষয়ে সচেষ্ট হয়। ১৯৯১ সালের পঞ্চম কংগ্রেসে বিলোপবাদীদের উদ্যোগে গঠনতন্ত্র ও অন্যান্য কিছু বিষয়ে পরিবর্তন এনে নতুন করে পার্টির ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মধারা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে অনুমোদনও করা হয় বিশেষ জাতীয় সম্মেলনে। পঞ্চম কংগ্রেসে (১৯৯১) নির্বাচিত কেন্দ্রিয় কমিটি বাতিল করে নতুন কেন্দ্রিয় কমিটি নির্বাচন করা হয়। বিশেষ জাতীয় সম্মেলন ছিল 'বিশেষ অবস্থায় আহুত সম্মেলন'। বিশেষ জাতীয় সম্মেলনের মূল শ্লোগান ছিল 'পার্টিকে বাঁচাও'। ১৯৯৫ সালের ষষ্ঠ জাতীয় সম্মেলনের সংগে বিশেষ জাতীয় সম্মেলনের গঠনতন্ত্র ও আর্দশগত দিক থেকে পার্থক্য ছিল। কারণ বিশেষ জাতীয় সম্মেলন পার্টির বিশেষ প্রয়োজনে আয়োজন করা হয়। অন্য জাতীয় সম্মেলন পার্টির গঠনতন্ত্র ও আর্দশগত বিষয়ে সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আয়োজিত হয়। এসব সম্মেলনের মূল শ্লোগান থাকে 'পার্টিকে সংহত কর' 'গুনগত মান বাড়াও' 'জোর কদমে সামনে চলো'।[55]

এ কংগ্রেসে ঘোষণা করা হয় হয়, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি মোটেও গোঁড়াপন্থী, সংকীর্ণতাবাদী, স্টালিনবাদী, আমলাতান্ত্রিক বা কট্টরবাদী হবে না। এ সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিবর্গ পার্টিকে শক্তিশালী ও সংহত করার লক্ষ্যে মত ব্যক্ত করেন।[56]

রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট দাবি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজটি বিশেষ জাতীয় সম্মেলনে নির্বাচিত নতুন কেন্দ্রিয় কমিটির প্রধান রাজনৈতিক কর্তব্য বলে চিহ্নিত করা হয়। এ সম্মেলনে জাতীয় উন্নয়ন ও বিকাশের কাজটিকে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এগিয়ে নেয়ার এবং সকল প্রকার সংকট অতিক্রম করে অগ্রগতির ধারা চলমান রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে গণতন্ত্রায়ন এবং অধিকতর সুষম বন্টন ও সামাজিক ন্যায় বিচারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু বিশেষ জাতীয় সম্মেলনে প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পার্টির ভাঙ্গন রোধ করা সম্ভব হয় না।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সংস্কারপন্থী) অংশটি মাত্র তিন মাস স্থায়ী হয়। এরপর এ অংশের বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু মাত্র তিন মাস পর সংস্কারপন্থীদের বড় বড় নীতি নির্ধারকগণ নূরুল ইসলাম নাহিদ, নুহ-উল-আলম লেনিন, দিলীপ বড়ুয়া, সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক দল ত্যাগ করে গণফোরাম, আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য মধ্য বাম দলে মিশে যায় এবং সংস্কারপন্থীদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে পড়ে।[57] অপরদিকে বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি (কট্টরপন্থী)-র অস্তিত্ব অক্ষুন্ন আছে আজও।[58] এরপর থেকে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নামের সংগে কট্টরপন্থী শব্দটি যোগ করা হয় নি।[59]

এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (কট্টরপন্থী) জরুরি সাংগঠনিক করণীয় কিছু প্রস্তাব প্রণয়ন করে, সেগুলি হলো---

১. পার্টি থেকে সংস্কারপন্থীরা বেরিয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বস্তরের পার্টির কাঠামো সংহত ও কার্যকর করার লক্ষ্যে জেলা কমিটি উপজেলা কমিটিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিতে যেসব শূন্যস্থান সৃষ্টি হবে তা কোঅপশনের মাধ্যমে পূরণ করে সত্বর কমিটিসমূহ পুনর্গঠন।
২. ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত সাংগঠনিক প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে রাজনৈতিক আন্দোলনগত ধারায় জনগণের মধ্যে উপযোগী করে তোলা।
৩. পার্টিকে পুনরুজ্জীবীত করে পরিপূর্ণ শক্তি নিয়ে পার্টির রাজনৈতিক সাংগঠনিক সিদ্ধান্তগুলো অতিসত্তর বাস্তবায়ন করা।

৪. স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সর্বত্র সুনির্দিষ্ট এলাকা ধরে পরিকল্পিতভাবে গণভিত্তি গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ।
৫. সর্বত্র শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর, ছাত্র, যুবক, শিক্ষক, মহিলা, শিশু, কিশোর প্রভৃতি সংগঠনগুলোকে তাদের নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী নিজ নিজ ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থ আদায়ের সংগ্রামে তৎপর করা।[60]

উপরের এ সকল নীতিমালার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে খন্ডিত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট (কট্টরপন্থী) পার্টি পূর্বের শৌর্য ফিরিয়ে আনার জন্য জনগণের প্রতি উদাত্ত আহবান জানায়। এরপর পরই বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে শক্তিশালী করার দিয়ে মনোযোগ দেওয়া হয়। এ উদ্দেশ্যে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় সেগুলি হলো----

১. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি পুনির্গঠিত হওয়ার জন্য ১৯৯৫ সালে ষষ্ঠ কংগ্রেস আয়োজন করা।
২. পার্টতে ভবিষ্যতে বহু মত ধারণ করা হবে, কিন্তু তা কোনভাবেই পার্টির মৌলিক নীতি আদর্শ ভিত্তি বিরোধী হতে পারবে না এবং সেই বহুমতের প্রকাশও একটি নির্ধারিত নিয়ম শৃঙ্খলার ভিত্তিতে হবে।
৩. পার্টির ভাঙ্গনের সময় জাতীয়ভাবে পরিচিত কেন্দ্রিয় নেতাদের একটি অংশ দলত্যাগ করায় পুনরায় নতুন কমরেডদেরকে জাতীয়ভাবে পরিচিত করে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়।
৪. পার্টির কর্মীদের মনোবল বাড়ানোর জন্য বেশি বেশি সভা সমাবেশের আয়োজন করা হয় এবং পার্টির মূল আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রচার করা হয়।
৫. নতুন কমরেডদেরকে পার্টির নেতা ও মুখপত্র হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে তাদের মধ্যকার দ্বিধা-আড়ষ্ঠতা ও পিছুটান দূর করা।
৬. পার্টির মধ্যে কেন্দ্র থেকে শুরু করে সর্বত্র সক্রিয় আত্মসচেতন বিপ্লবী কর্মীর চেয়ে নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকার প্রবণতা কমানোর জন্য চেষ্টা করা হয়।
৭. ১৯৯৩ সালের পর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি দেশব্যাপী সদস্যপদ বাড়ানোর কাজ শুরু করে। ১৯৯৫ সালের ষষ্ঠ কংগ্রেস রিপোর্টের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় ১৯৯৩ সালে পার্টির সদস্যসংখ্যা ৪,৭৬৬ জন থেকে ১৯৯৪ সালের শেষে পার্টির সদস্যসংখ্যা হয় ৬,৭১২ জনে উন্নিত হয়।
৮. পার্টিকে দৃঢ় অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য গ্রুপ গঠন করে গণসংগঠনের কাজে সম্পৃক্ত করা হয়।
৯. তত্ত্বগত বিষয়ে প্রচুর লেখালেখি, সহজ পাঠ পুস্তিকা রচনা ও গবেষণা কাজে মনোযোগ দেয়া হয়।
১০. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত পতনের পর যে নতুন বিশ্বব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট পার্টিগুলো রয়েছে তাদের সংগে সহযোগিতা ও সংযোগ বৃদ্ধি করার কাজটি গুরুত্বসহকারে করা হয়।
১১. ভাঙ্গনের পর পার্টির আর্থিক অবস্থা দুর্বল হয়ে যায়। আর্থিক পরিস্থিতি উন্নত করার জন্য পার্টির কেন্দ্র থেকে প্রচার চালায় 'পার্টির প্রতিটি পয়সা পবিত্র' এই বলে। এভাবে তহবিল সংগ্রহের কাজ শুরু করে।
১২. পার্টির সর্বক্ষেত্রে (সদস্যপদ বহাল রাখতে হলে ন্যূনতম উপস্থিতি, রাজনৈতিক সংগঠনের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ, পার্টির পত্রিকা পাঠ ও বিক্রি, গ্রুপ গঠন ও পরিচালনা ও রিক্রুটমেন্টের কাজ) পর্যবেক্ষণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়।[61]

এভাবে দেখা যায় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি নিজেদের অস্তিত্বকে সুসংহত ও সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা চালায়। পার্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয় শুধুমাত্র নিজেদেরকে শক্তিশালী করা নয় বরং দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখা।[62] এভাবে দেখা যায়, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি নব্বই এর দশকে সংকটজনক অবস্থা অতিবাহিত করলেও জাতীয় রাজনীতির সংগে তাদের সম্পর্ক থাকে। যেমন, ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সরকার গঠন করে। নির্বাচন

পরবর্তী সময়েও পার্টি ভূমিকা রাখতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু পার্টির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে জাতীয় রাজনীতিতে কমিউনিস্ট পার্টির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না। তারপরও পার্টি রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে, জাতির মর্যাদা ও দেশের সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে, দেশবাসীর দৈনন্দিন জীবনে, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে, পরিবেশ ও প্রকৃতিতে, নগর জীবন ও গ্রামীণ জীবন নিয়ে পর্যালোচনা ও আলোচনা করে যাতে করে জাতীয় রাজনীতিকে স্থবিরতা ও অবক্ষয় গ্রাস না করে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক শক্তি ভারসাম্যের বাস্তবতা এবং দেশের মধ্যকার রাজনৈতিক অবস্থার পটভূমিতে বাংলাদেশ বিশ্ব পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। তাই বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য দলকে আরো সুসংগঠিত হতে হবে বলে মনে করা হয়।[63]

উপসংহার

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ১৯৯০-এর দশকটি বিশ্ব রাজনৈতিক পরিবর্তনের ছায়ায় এক গভীর সংকটের সময়কাল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধস কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশকে (সিপিবি) আদর্শগত ও সাংগঠনিকভাবে ক্ষয়িষ্ণু করে তুলেছে। এই সময়ে দলের অভ্যন্তরে সংস্কারপন্থী এবং কট্টরপন্থীদের মধ্যে উদ্ভূত দ্বন্দ্ব শুধুমাত্র তাত্ত্বিক বিতর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এটি বৈশ্বিক সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা এবং স্থানীয় রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে সামঞ্জস্য খোঁজার এক জটিল প্রচেষ্টার প্রতিফলন ছিল। সংস্কারপন্থীরা গ্লাসনোস্ত এবং পেরেস্ত্রোইকার মতো সোভিয়েত সংস্কারকে অনুসরণ করে পার্টির গঠনতন্ত্র এবং আদর্শকে আধুনিকীকরণের পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন, যাতে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটে সমাজতন্ত্রকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তোলা যায়, যেমন ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং এনজিও-ভিত্তিক সংগঠনের মতো উপাদানগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। অন্যদিকে, কট্টরপন্থীরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ঐতিহ্যবাহী প্রয়োগে অনড় থেকে সংস্কারকে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখেছিলেন, যা দলের বিশুদ্ধতা এবং বিপ্লবী চরিত্রকে ক্ষুণ্ন করবে। এই দ্বন্দ্বের ফলে ১৯৯৩ সালে পার্টির বিভক্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে, যা সিপিবিকে দুর্বল করে তুলেছে এবং জাতীয় রাজনীতিতে তার প্রভাবকে প্রান্তিক করে দিয়েছে, যেমন আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটবদ্ধতা সত্ত্বেও স্বতন্ত্র ভূমিকা হারানো। তবে এই সংকট একদিকে যেমন আন্দোলনের সোভিয়েত-নির্ভরতার দুর্বলতাকে উন্মোচিত করেছে, অন্যদিকে এটি শিক্ষা দিয়েছে যে স্থানীয় বাস্তবতা-যেমন ধর্মীয় সংখ্যালঘু অধিকার, দারিদ্র্য বিমোচন এবং পরিবেশ সুরক্ষা-কে অন্তর্ভুক্ত করে সমাজতন্ত্রকে পুনর্ব্যাখ্যা করা দরকার, যাতে ভবিষ্যতে বামপন্থী আন্দোলন আরও স্থিতিস্থাপক হয়। সামগ্রিকভাবে, এই দশকটি কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্য একটি সন্ধিক্ষণ ছিল, যা বিপ্লবী আদর্শ এবং বাস্তব রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মধ্যে ভারসাম্য খোঁজার ব্যর্থতা দেখিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের বাম রাজনীতির পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে, যা আজও প্রাসঙ্গিক।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ Martin Mccauley, *The Rise and Fall of the Soviet Union,* (London: Routledge, 2010), p. 492.

২ Mikhail Gorbachev, "History and Hope" access date: 24 January 2024, website: http://cmabee2012.wordpress.com/mikhail-gorbachev/

৩ *Ibid.*

৪ "Russia." Encyclopaedia Britannica. *Encyclopoedia Britannica Ultimae Reference Suite.* Chicago: Encyclopedia Britannica, 2013, access date: 24 January 2024.

৫ Donald W. Treadgold, *TWENTITH CENTURY RUSSIA,* (New York: Westview press, 1990), pp. 504-515.

[৬] *Ibid,* p. 505.

[৭] Archie Brown, *The Gorbachev Factor (*Oxford: Oxford University Press, 1996), pp.152-155.

[৮] "Perestroika," Microsoft® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation, access date: 24 January 2024.

[৯] John. M. Thompson, *Russia and the soviet Union, An Historical Introduction,* (Oxford: Westview Press, 1990), p. 277.

[১০] Stephen Kotkin, *Armageddon Averted: The Soviet Collapse, 1970-2000* (Oxford: Westview Press, 1990), p. 277.

[১১] Charles Downer Hazen, *Modern Europe Since 1984,* (New Delhi: S. Chand and Co. Ltd., 2004), p. 88.

[১২] John, M. Thompson, *ibid,* p. 251.

[১৩] *Ibid,* p. 252.

[১৪] *Ibid,* pp. 252-253.

[১৫] "The Collapes of the Soviet Union" access date: 31 October, 2013, https://history .state.gov/milestones/1989-1992/collapse-soviet-union.

[১৬] জর্জ আগানবেগান (George Aganbegyan) ছিলেন একজন বিশিষ্ট সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ এবং রাশিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্সেসের সদস্য। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁর কাজ বিশেষত ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে সোভিয়েত অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হ্রাসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তিনি বেশ কিছু বই লিখেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো The Economic Challenge of Perestroika, (Moscow: I.B.Tauris, 1988) এই বইটিতে তিনি সোভিয়েত অর্থনীতির পুনর্গঠন এবং গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রইকা (গর্বাচেভের সময়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

[১৭] *দৈনিক সংবাদ*, ১৫ মার্চ, ১৯৯০।

[১৮] Donald W. Treadgold, *Op cit.* p. 509.

[১৯] "Fall of the Soviet Union" date of access 28 January 2024, http://www.coldwar.org/articles/ 90s/fall_of_the_soviet_union.asp.

[২০] Suny, Ronald Grigor, *The Soviet Experiment: Russia, the USSR, and the Successor States*, (New York: Oxford University Press), 1998.

[২১] সাক্ষাৎকার: মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১, স্থান: পার্টির কেন্দ্রিয় কার্যালয় পুনারা পল্টন, ঢাকা।

[২২] সাক্ষাৎকার: অ্যাডভোকেট রণেশ মৈত্র, বামপন্থী নেতা, সাক্ষাৎকার গ্রহণ ২৩ জানুয়ারি ২০১৪।

[২৩] সাক্ষাৎকার: মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, *পূর্বোক্ত*।

[২৪] *ঐ*।

[২৫] *ঐ*।

[২৬] *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটির রিপোর্ট, পঞ্চম কংগ্রেস*, ৩-৮ অক্টোবর, ১৯৯১, পৃ. ৭৮।

[২৭] *ঐ*।

[২৮] *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস রিপোর্ট*, ১৯৯১।

[২৯] *ঐ*।

[৩০] *ঐ*।

[৩১] *ঐ*।

[৩২] *ঐ*।

[৩৩] এম. আর. চৌধুরী, *সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম*, (খুলনা: আহম্মদিয়া প্রেস, ২০১০), পৃ. ২৯।

[৩৪] *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ জাতীয় সম্মেলন রিপোর্ট* ,১৯৯৩, পৃ. ১৩।

৩৫ *ঐ*।

৩৬ *ঐ*।

৩৭ *ঐ*।

৩৮ লিফলেট: *গণভিত্তি সম্পন্ন কমিউনিস্ট পাটি গড়ে তোলার লক্ষ্যে গণক্লাস আলোচ্য বিষয়*, বাংলাদেশের কিমউনিস্ট পার্টির তত্ত্ব, শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত, ২০০২ সাল।

৩৯ *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ জাতীয় সম্মেলন*, ১৯৯৩।

৪০ *ঐ।*

৪১ *ঐ*।

৪২ *ঐ*।

৪৩ লিফলেট: *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটির রিপোর্ট আকারে ১৩ জন ভিন্নমতাবলম্বীদের বক্তব্যের জবাব*, ১৯৯১।

৪৪ *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেস রির্পোট*, ১৯৯৫।

৪৫ *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ জাতীয় সম্মেলন*, ১৯৯৩।

৪৬ *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (রূপান্তরপন্থী)-এর কর্মসূচি, ১৯৯৩।*

৪৭ *ঐ*।

৪৮ *দৈনিক সংবাদ*, ৪ মে, ১৯৯৩।

৪৯ *দৈনিক সংবাদ*, ৯ জুন, ১৯৯৩।

৫০ *বাংলার বাণী*, ৬ জুন, ১৯৯৩।

৫১ *বাংলার বাণী*, ৭ মে, ১৯৯৩।

৫২ *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসের কেন্দ্রিয় কমিটির রিপোর্ট*, ১৯৯৫।

৫৩ *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৭ জুন, ১৯৯৩।

৫৪ *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৭ জুন, ১৯৯৩।

৫৫ *বাংলাদেশের কমিউনিস্টি পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেস রিপোর্ট*, ১৯৯৫।

৫৬ *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ জাতীয় সম্মেলন*, ১৯৯৩।

৫৭ *দৈনিক সংবাদ*, ১৬ জুন, ১৯৯৩।

৫৮ গবেষক কর্তৃক গৃহীত ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার: মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সভাপতি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, তারিখ: ১৫ মে ২০১৩, সাক্ষাৎকারের স্থান: বাংলাদেমের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, পুরানা পল্টন, মুক্তি ভবন, ঢাকা।

৫৯ *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস রিপোর্ট*, ১৯৯৯।

৬০ *ঐ*।

৬১ *ঐ*।

৬২ *ঐ*।

৬৩ *ঐ*।